স্বর্ণপরশ বণিক।

সর্ব্বশেষে একটী ছোট গল্প বলিয়া তোমাদের কাছে বিদায় লইব। পাঠকপাঠিকাগণ, আমার বিদায়ে তোমরা কি দুঃখিত হইবে, না হাঁপ ছাড়িয়া বলিবে, "যাক্, আপদ গেল ?"

দেখ, প্রাচীন কালে সুবর্ণরেখা নদীতীরে এক গ্রাম ছিল. তথায় রত্নপাল নামে এক বণিক বাস করিতেন। তাঁহার একটী দশ বার বৎসরের মেয়ে ; তার নাম ললিতা। রত্নপাল অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। অত্যন্ত ধনী লোকেরা প্রায়শঃ অত্যন্ত কৃপণ হইয়া থাকে ; রত্নপালও তাহাই হইয়াছিলেন। তাঁর ধনের পিপাসা কিছুতেই মিটিত না। তিনি স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছু দেখিতে ভাল বাসিতেন না, স্বর্ণমুদ্রা গুলির ঝন্‌ঝনাৎকার শব্দ ব্যতীত আর কিছু শুনিতে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি কন্যা ললিতাকে ভালবাসিতেন না, তাহা নহে। সংসারে দুইটী মাত্র জিনিসে তাঁহার মমতা ছিল ; প্রথম স্বর্ণ, পরে কন্যা। তাঁর শয়নগৃহের নীচে এক অতি প্রশস্ত অন্ধকার কক্ষ ছিল। তাহার লোহার কপাট ও লোহার জানালা। সেই কক্ষে তিনি

স্তূপে স্তূপে তাঁহার স্বর্ণমুদ্রা, স্বর্ণের বাসনপত্র ও অন্যান্য বহুমূল্য সম্পত্তি রাখিতেন। আহার নিদ্রার সময় ব্যতীত তিনি প্রায় সর্ব্বদাই সেই কক্ষমধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। কখনো মুদ্রাগুলি, কখনো বাসনপত্রগুলি, কখনো বা আর আর সম্পত্তি গুলি গণিতেন ও নাড়িতেন চাড়িতেন। ইহাতে তাঁহার অত্যন্ত সুখ হইত; আবার দুঃখও হইত। ভাবিতেন—

একটী একটী করি সংগ্রহ করিয়া
এইমাত্র লভিয়াছি জীবন ভরিয়া
আহাহা! এমন ক্ষুদ্র মনুষ্যজীবন,
এক জীবনেতে আর কত হ'বে ধন?
লক্ষ বর্ষ পরমায়ু আমাদের হয়,
ধন সংগ্রহের তবে কিঞ্চিৎ সময়;
অথবা পরশমণি কোনখানে পাই
স্বর্ণের পিপাসা আমি তা'হলে মিটাই!

একদিন বসিয়া বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন যে, একটী দিব্য সুন্দর পুরুষ দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। রত্নপাল প্রথমে অত্যন্ত ভীত পরে অত্যন্ত বিস্মিত ও কুপিত হইলেন—

"কে তুমি? কে তুমি এলে কক্ষের ভিতর?
চোর বুঝি?—দস্যু বুঝি?—দাঁড়াও, পামর!"

এই বলিয়া তিনি তরবার খুলিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তখনি ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলেন যে, আগন্তুকের চোর কিম্বা দস্যুর

লক্ষণ কিছুই নাই ; দিব্য শান্ত পুরুষটী, অল্প অল্প হাসিতেছেন। বিশেষ, কক্ষের দরজা যেমন বন্ধ তেমনই রহিয়াছে, মানুষ প্রবেশ করিবে কেমন করিয়া? রত্নপাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। আগন্তুক কহিলেন—

"চোর কিম্বা দস্যু আমি নহি, মহাশয়,
বৃথা ক্রোধ করিতেছ, বৃথা তব ভয়।"

বণিক লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে তুমি কে? কি জন্য আসিয়াছ? আর কিরূপেই বা এ গৃহে প্রবেশ করিলে?"

আগন্তুক কহিলেন—

"যে হই সে হই আমি, যেমনেই হয়
প্রবেশ করেছি কক্ষে—সে কথা নিশ্চয় ;
কক্ষতল কিম্বা ছাদ কিম্বা হ'তে পারে—
দেয়াল ভেদিয়া আমি আসিয়াছি ঘরে।
বোধ হয় যাদু জানি কিম্বা দৈববলে
যেখানে সেখানে মম গতিবিধি চলে।
রত্নপাল, দেখিতেছি এখনও তোমার
বলবতী ধনতৃষ্ণা হয়নি নিবার'।"

রত্নপাল কহিলেন—

"কেমনে হইবে? দেখ সমস্ত জীবন
এত শ্রম, এত চেষ্টা, এমন যতন—
প্রাণান্ত আয়াস করি এই মাত্র লাভ
এই এক মুষ্টি ধন—হায় মনস্তাপ!

ইচ্ছা করে বক্ষ হতে মাংস করি দান
কেহ যদি স্বর্ণ দেয় সম পরিমাণ !
হায়রে, সুবর্ণ ! হায়, আরাধ্য আমার !
এ জীবনে আশাপূর্ণ হবে নাকি আর ?

তাহা শুনিয়া আগন্তুক মৃদু মৃদু হাসিলেন ; কহিলেন—

"এত ধনে প্রয়োজন কি বল তোমার,
এত যে রয়েছে, আশা মিটে নাকি আর ?
পর্ব্বত করেছ, বাছা, স্বর্ণরত্নধনে
ভুঞ্জিলে না কোন সুখ আপন জীবনে ;
চিন্তায় শরীর ক্ষয় করিছ কেবল
পাছে কেহ নিয়ে যায় সম্পদ সকল।
জীবনের শেষে এবে আসিয়াছ প্রায়,
ভোগের সময় দেখি ফুরায় ফুরায়
সঙ্গে কিছু নিবে কি হে বৈতরণী পারে ?
সে কথাটী, রত্নপাল, কহতো আমারে।
একটী সন্তান মাত্র ললিতা তোমার,
দু'হাতে ছড়ালে ধন ফুরাবে না তার।
রত্নপাল, স্বর্ণে আর নাহি প্রয়োজন,
ব্যাকুলতা পরিহরি শান্ত কর মন।"

রত্নপাল ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন—

"কি বল, নির্ব্বোধ, ধনে নাহি প্রয়োজন,
কি কারণে তবে আর বহিব জীবন ?

জানিনা কিছুই আর স্বর্ণরত্ন বই
শ্মশানে যেতেও পথে পাই যদি লই!
তুমি ধ্যান, তুমি জ্ঞান, পরমার্থ ধন,
হে সুবর্ণ, তুমি সত্য, তুমি সনাতন!
তোমার পূজায় ভবে জীবন কাটাই
অন্তিমে তোমারি দেহে মিশে যেন যাই!"

আগন্তুক আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিতেছিলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি কহিলেন—"শুন, রত্নপাল, আমি যদি দেবতা হই, আর তোমাকে অভিলষিত বর দিতে আসিয়া থাকি, তবে তুমি কি বর প্রার্থনা কর? রত্নপাল অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আগন্তুকের মুখ পানে তাকাইলেন; তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও আশায় উথলিয়া উঠিল; কেননা, তাঁহারো মনে কতকটা এইরূপ ভাবেরই উদয় হইতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন, যদি ইনি দেবতাই না হবেন তবে এ গৃহে প্রবেশ করিলেন কিরূপে? আর দেবতাই যদি হন তবে আমাকে বর দিবার অভিপ্রায় না থাকিলে কেন আসিবেন? ইনি নিশ্চয় দেবকোষাধ্যক্ষ কুবের; আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাকে ঈপ্সিত বর প্রদান করিতে আসিয়াছেন। এইরূপ মনে করিয়া তিনি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত গভীর ভাবে চিন্তা করিলেন; পরে তাঁহার মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল; তিনি কহিলেন—

হে দেব, কুবের তুমি এই মনে লয়,
প্রসন্ন এ অকিঞ্চনে হয়েছ নিশ্চয়।

এই বর দেহ মোরে—বর(ই) যদি দিবে—
যাহা পরশিব তাই সুবর্ণ হইবে !

আগন্তুক কহিলেন —

"এ বরে কামনা তব হবে তো পূরণ ?
ভাল ক'রে বুঝে সুঝে করো আকিঞ্চন ;
আমাকে দূষো না যেন শেষে, মহাশয়,
"ছেড়ে দে, মা, কেঁদে বাঁচি" সে দশা না হয় !"

রত্নপাল আগ্রহের সহিত কহিলেন—

"ভাল ক'রে বুঝিয়াছি, মনে নাহি আন—
আমাকে এ বর, দেব, করুণ প্রদান ;
পায়ে পড়ি, এই(ই) বর—অন্য বর নয়—
আমার পরশে স্বর্ণ হ'বে সমুদয়।
আহারে ! আহারে ! কিবা সুখ-পারাবার—
জীবন্ত পরশমণি হইব এবার !"

তখন আগন্তুক কহিলেন—"তথাস্তু ; আগামী কল্য সূর্য্যোদয় হইতে তোমার স্পর্শে সমস্ত বস্তুই সুবর্ণ হইবে।" এই বলিয়া তিনি কখন কোন্ পথে অন্তর্হিত হইলেন, রত্নপাল তাহা জানেন না ; তিনি আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন।

যে ভাবে তাঁর সে রাত্রি প্রভাত হইল তাহা তিনিই জানেন। আহার নিদ্রা তো দূরের কথা, সন্ধ্যার পরক্ষণ হইতেই রাত্রি কেন প্রভাত হয় না এই ক্ষোভে তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইবার মত হইল। যাহা হোক্, দিনরাত্রি কাহারো

সুখের খাতিরেও বসিয়া থাকে না, দুঃখের খাতিরেও নয়। সে রাত্রিও যথা সময়ে প্রভাত হইল। পূর্ব্বাকাশে একটু আলো দেখা দিবামাত্রই রত্নপাল গৃহস্থিত এটা, ওটা, সেটা ছুঁইতে লাগিলেন। কিন্তু কোনটাই তো সোণা হইল না! যা! তবে কি দেবতা ছলনা করিলেন? রত্নপালের বুক যেন নিরাশা ও দুঃখে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইল। তিনি একখানি কাষ্ঠাসনের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিল তখন সূর্য্য উঠিয়াছে। রত্নপাল বিহ্বলের মত চাহিয়া দেখেন, তিনি একখানি সোণার আসনে পড়িয়া আছেন। তখন সহসা সব কথা মনে পড়িল; তাঁহার পরশে কাঠের আসন সোণার আসন হইয়াছে, বুঝিলেন। ইহাও বুঝিলেন যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে বর ফলে নাই—সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ফলিয়াছে। রত্নপালের মনে যে আনন্দ হইল তাহা বর্ণন করে কার সাধ্য? তিনি ঊর্দ্ধশ্বাসে এটা, ওটা, সেটা—গৃহের মধ্যে যত দ্রব্য ছিল সব গুলি হাতে, পায়ে, নাকে, মুখে স্পর্শ করিতে লাগিলেন, সবগুলি তৎক্ষণাৎ স্বর্ণ হইয়া গেল! তিনি যে কাপড় পরিয়াছিলেন তাহাও সোণার সূতার কাপড় হইয়াছিল—এতক্ষণ নজর করেন নাই, এখন দেখিলেন। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া বাগানে রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া প্রভায় চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়াছে, দেখিলেন; দেখিয়া মনে করিলেন ঐ ফুলগুলিকে সোণার ফুল করিব। তৎক্ষণাৎ বাগানের দিকে ছুটিয়া গেলেন। যাইতে যেখানে যেখানে পা ফেলেন,

সেখানকার ইট, পাথর, মাটি, কাঠ—সব সোণা হইয়া যায়। রত্নপালের মনে ভাবনা হইল, এত সোণা রাখি কোথায়? এত সোণা লুকাব কি প্রকারে? এত বেশী বেশী সোণা হইলে সকলেই লইয়া যাইবে, আমি কেমন করিয়া বারণ করিব? আমিই আর তাহা হইলে একমাত্র ধনী রহিব না। ভাবিতে ভাবিতে তিনি বাগানে প্রবেশ করিয়া অন্যমনস্কভাবে কতগুলি ফুল ছুঁইলেন—সবগুলি সোণার ফুল হইয়া সূর্য্য-কিরণে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তাহাদের আর সৌরভ রহিল না।

রত্নপালের মনে ভাবনা প্রবেশ করিয়াছে। হায়রে! নির-বিচ্ছিন্ন সুখ কিছুতেই নাই। তিনি ভাবিতে লাগিলেন—আমার স্পর্শে সমস্ত দ্রব্য সোণা হয়, একথা তো আজই প্রকাশ হইয়া পড়িবে, তখন লোকে আমাকে যদি মায়াবী কি অপদেবতা বলিয়া মারিয়া ফেলে? মনে মনে স্থির করিলেন—ঘর হইতে বাহির হইব না; আর বেশী কিছু স্পর্শ করিব না। এই সঙ্কল্প করিয়া গৃহমধ্যে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। আহারের বেলা হইলে কন্যা ললিতাকে ডাকিয়া কহিলেন—"মা ললিতা, ভৃত্য-গণের আসিবার প্রয়োজন নাই, তুমি আমার অন্নব্যঞ্জন লইয়া আইস।" ললিতা পিত্তলের থালা ও বাটীতে অন্নব্যঞ্জন আনিয়া দিয়া চলিয়া গেল, কোন দিকে বড় দৃষ্টি করিল না। রত্নপালের অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছিল, তিনি আহারে বসিলেন। থালাখানি সম্মুখে টানিয়া লইতে পিত্তলের থালা স্বর্ণ হইল; হউক, ক্ষতি নাই। ভাতে হাত দিতেই ভাত—হরিহে!—ভাত তো আর

ভাত রহিল না, সব সোণার দানা হইয়া গেল! সোণার দানা কি খাওয়া যায়? রত্নপাল হতভম্বের ন্যায় হইলেন। একবার মনে করিলেন—আচ্ছা দেখি, হঠাৎ মুখে ফেলিয়া দিলে খাওয়া যায় কি না; এই মনে করিয়া ভাতের থালা সরাইয়া রাখিয়া একটা বাটিতে পায়স ছিল, বাটিটা কিনারায় ধরিলেন—পায়স ছুঁইলেন না—এবং হাঁ করিয়া বাটি উপুড় করিয়া পায়সগুলি মুখে ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু হায়, সে আশাতেও ছাই! চাল ও দুধের পায়স মুখে পড়িবামাত্র সোণার দানা ও তরল সোনা হইয়া গেল। পায়স গরম ছিল, রত্নপালের জিহ্বা ও তালু পুড়িয়া গেল। তিনি থু থু করিয়া মুখের সোণা ফেলিয়া দিয়া জলপাত্র মুখে তুলিলেন, জল তাঁহার ওষ্ঠ স্পর্শ করিবামাত্র তরল স্বর্ণে পরিবর্ত্তিত হইল। বৃদ্ধ রত্নপালের আর সহ্য হইল না—তিনি "হায়! হায়!" করিয়া কান্দিয়া উঠিলেন। তাঁহার কাতর চীৎকার শুনিয়া তাঁহার কন্যা ললিতা দৌড়িয়া আসিল এবং "বাবা, কি হইয়াছে? কান্দিতেছ কেন?" বলিতে বলিতে তাঁহাকে সাপটিয়া ধরিল আর তৎক্ষণাৎ তাহার রক্ত-মাংসের দেহ যাইয়া সোণার দেহ হইল—জীবন আর রহিল না—হায়! হায়! কি হইল!

তখন রত্নপাল শোকে পাগল হইলেন। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন এবং বুকে করাঘাত করিতে করিতে ভূমিতলে লুটাইতে লাগিলেন, তাহাতে ঘরের মেঝেটা সোণায় বান্ধা হইয়া গেল। রত্নপাল আকুল হইয়া কান্দিতেছেন, কখনো

শোকে মূর্চ্ছিত হইতেছেন, আবার আপনা আপনিই চৈতন্য হইতেছে। একবার চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, যিনি তাঁহাকে বর দিয়াছিলেন, তিনি গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া গম্ভীর-ভাবে তাঁহাকে দেখিতেছেন। রত্নপাল কোন প্রকারে উঠিয়া গিয়া তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন; ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন—

"ফিরে নেও বর, দেব, বাঁচাও বাঁচাও,
আমার কন্যাকে, দেব, প্রাণ ফিরে দাও।
চাইনা সুবর্ণ—ধনে প্রয়োজন নাই;
দূর করে ফেলে দাও হীরা, মণি, ছাই!
বর ফিরে নাও, দয়া কর, দয়াময়,
আমার পরশে স্বর্ণ আর নাহি হয়।
হায়! হায়! কি হলো রে! কি করি উপায়,
ললিতাকে রক্ষা কর—বাঁচাও আমায়!"

আগন্তুক ধীরগম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—

"এতক্ষণে হইয়াছে জ্ঞানের সঞ্চার,
এতক্ষণে ধনতৃষ্ণা মিটেছে তোমার।
ভাল, রত্নপাল, তুমি বুঝেছ কি এবে
বড় বেশী কোন কিছু ভাল নয় ভবে?

বণিক আগ্রহের সহিত কহিলেন—

"বুঝেছি, বুঝেছি, দেব, বুঝেছি এখন;
ধনতৃষ্ণা মিটিয়াছে জন্মের মতন।

ললিতাকে রক্ষা কর ফিরে নেও বর,
করুণা কটাক্ষ কর বৃদ্ধের উপর।

তখন আগন্তুক রত্নপালকে এক কমণ্ডলু জল দিয়া কহিলেন—

"কন্যার শরীরে ইহা করহ সিঞ্চন
যেমন আছিল দেহ হইবে তেমন;
স্বর্ণ করিয়াছ যত দেবা সমুদায়
এই জলে পূর্ব্বমূর্ত্তি পাবে পুনরায়।

রত্নপাল আগ্রহের সহিত তাঁহার হস্ত হইতে কমণ্ডলু লইয়া প্রায় সমস্ত জলটাই ললিতার মাথায় ঢালিয়া দিলেন। ললিতা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া কহিল, "বাবা, বাবা, কর কি? আমার যে সর্দ্দি হবে!" মুহূর্ত্ত মধ্যে ললিতা পূর্ব্বদেহ ও জীবন পাইয়াছিল, সে যে সুবর্ণপ্রতিমা হইয়াছিল, তাহা সে জানিতও না। অনন্তর রত্নপাল অবশিষ্ট জল দ্বারায় গৃহের কতককতক বস্তু ও বাগানের কতক কতক ফুল পূর্ব্বাবস্থায় আনিলেন; শেষে জল আর নাই। হাজার হাজার মণ সুবর্ণ রহিয়া গেল। ইহার কিছুদিন পরে সুবর্ণরেখা নদীতে বৃদ্ধ বণিকের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেখ, কতকাল গিয়াছে, এখনো ঐ নদীর বালুতে সোণা পাওয়া যায়।